বুধোর মায়ের মৃত্যু

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

বুধো মণ্ডলের মায়ের হাতে টাকা আছে সবাই বলে। বুধো মণ্ডলের অবস্থা ভালো, ধানের গোলা দু-তিনটে। এত বড় যে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ গেল গত বছর, কত লোক না খেয়ে মারা গেল, বুধো মণ্ডলের গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি। বরং ধানের গোলা থেকে অনেককে ধান কর্জ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সবাই বলে, বুধোর টাকা বা ধান সবই ওই মায়ের। বুধোর নিজের কিছুই নেই। বুড়ির দাপটে বুধো মণ্ডলকে চুপ করে থাকতে হয়, যদিও তার বয়েস হল এই সাতচল্লিশ। ওর মার বয়স বাহাত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু অত্যন্ত বাল্যকাল থেকে ওকে যেমন দেখে এসেছি, এখনো (অনেককাল পরে দেশে এসে আবার বাস করছি কিনা) ঠিক তেমনি আছে। তবে মাথায় চুলগুলো যা পেকেছে।

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে। হরি রায়ের পাঠশালায় আমি তখন পড়ি। বিকেলবেলা, তেঁতুল গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে হরি রায়ের ক্ষুদ্র চালাঘরের সামনেকার সারা উঠোন ছেয়ে ফেলেছে। ছুটি হয়-হয়, নামতা পড়ানো শুরু হবে এখন—এমন সময় কালীপদ রায় আর চণ্ডীদাস মুখুজ্যে এসে হরি রায়ের সঙ্গে গল্প জুড়লেন। কালীপদ রায় গল্পের মধ্যে বুধোর মায়ের সম্বন্ধে এমন একটা উক্তি করে বসলেন যাতে আমি অবাক হয়ে প্রৌঢ় দাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

চণ্ডী মুখুজ্যে মশায় জবাব দিলেন, আর বোলো না ও মাগীর কথা, অনেক টাকা খুইয়েছি ও মাগীর পেছনে।—জবাবটা আজও বেশ মনে আছে।

একটু বেশি পাকা ছিলাম বয়েসের তুলনায়, সুতরাং স্ত্রীলোকের পেছনে টাকা খরচ করার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম। আর একটু বয়েস বাড়লে শুনেছিলাম, বুধোর মা গ্রামের অনেকেরই মাথা খারাপ করেছিল। বুধোর মা বালবিধবা; ওই ছেলেটিকে নিয়ে স্বামীর গোলার ধান দাদন দিয়ে কত কষ্টে সংসার নির্বাহ করেছে—এই রকমই শুনতাম। আমি যখনকার কথা বলছি তখন বুধোর মায়ের বয়েস চল্লিশের কম নয়, কিন্তু তখনো তার বেশ চেহারা। আঁটসাঁট গড়ন, মাথায় একঢাল কালো চুল। আমার বাবার বয়সী গ্রামসুদ্ধ লোকের প্রণয়িনী।

তার পর বহুবার বুধোর মাকে দেখেছি অনেক বছর ধরে। সেই এক চেহারা। এতটুকু টস্কায়নি কোনোদিন।

দেশ ছেড়ে চলে গেলাম ম্যাট্রিক পাশ করে। পড়াশুনো শেষ করে বিদেশে চাকরি করে বোমার তাড়ায় সেবার আবার এসে গ্রামে ঘর-বাড়ি সারিয়ে বাস করতে শুরু করলাম।

কাকে জিজ্ঞেস করলাম—বলি, সেই বুধোর মা বেঁচে আছে ?

—খুব। কাল ঘাটে দেখলে না ?

—না।

—আজ দেখো এখন। তার মাথার চুল পেকে গিয়েছে বলে চিনতে পারনি।

দু-একদিনের মধ্যে বুধোর মাকে দেখলাম। চেহারা ঠিক তেমনিই আছে, যেমন দেখেছিলাম বাল্যে। মুখশ্রী বিশেষ বদলায়নি। শুধু মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছে মাত্র। অনেকে হয়তো ভাববেন, সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সে মুখের চেহারা বদলায়নি এ কখনো সম্ভব ?তাঁরা বুধোর মাকে দেখেননি। নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। সেকালের বুধোর মার মাথায় যেন সাদা পরচুলো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দেখবার দিন আমার এমনি মনে হল।

পরে কিন্তু বুঝলাম তা নয়, ওর বয়স হয়েছে। একদিন আমার বাড়িতে বুড়ি লেবু দিতে এসেছিল। ওকে দেখে মনে হল, হায় রে কালীপদ দাদু, চণ্ডীদাস জেঠার দল ! আজও তোমরা বেঁচে থাকলে তোমাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারত বুধোর মা ! কত পয়সাই এক সময়ে তোমরা খরচ করে গিয়েছ ওর পেছনে !

বললাম—এসো বুধোর মা, কি মনে করে ?অনেকদিন পরে দেখলাম।

—আর বাবা ! গাঁয়ে ঘরে থাকো না, তা কি করে দেখবা ?বাত হয়েছে বাবা। এখন একটু সামলেছি। তাই উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি।

—হাতে কি ?

—গোটাকতক কাগজি লেবু। বলি, দিয়ে আসি যাই। তুমি আর আমার পঞ্চা দুমাসের ছোটবড়। তুমি হলে ভাদ্র মাসে, পঞ্চা হয়েছে আষাঢ় মাসে। তা আমায় ফেলে চলে গেল।

—পঞ্চা মারা গিয়েছে ?

—হ্যাঁ বাবা, অনেক দিন হয়েছে, বছর তিন-চার হল।

গাঁয়ের যাকে জিজ্ঞেস করি, ওকে ভালো কেউ বলে না। একদিন ওদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি ওদের বাড়িতে ঝগড়া ও কান্নাকাটির শব্দ।

দাসু কুমোর রাস্তার ধারেই পণ পোড়াচ্ছে।

বললাম—পণে আগুন দিলে কবে দাসু ?

—প্রাতোপেন্নাম দা'ঠাকুর। পণ কাল ধরিয়েছি। জ্বলছে না ভালো। অনেক হাঁড়ি কাঁচা আসবে। কাঠের অমিল, দা'ঠাকুর।

—তোরা কি কাঠ দিয়ে পণ জ্বালাস, না পাতা দিয়ে ?

—শুধু পাতা কি জ্বলে, দা'ঠাকুরের কথার যেমন ধারা।

—হ্যাঁরে, বুধোদের বাড়িতে কান্নাকাটি কিসের রে ?

—ওই বুধোর মা ছেলের বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করছে।

—বুধোর বউ বুঝি ঝগড়াটে ?

—ওই বুড়ি আসল ঝগড়াটে। ওর দাপটে অত বড় বুড়ো ছেলের টুঁ শব্দ করবার জো নেই, তা ছেলের বউ-এর ! সব মুঠোর মধ্যে পুরে বসে আছে। টাকাকড়ি, ধানের গোলা সব ওর নামে। ছেলে কাজেই জুজু হয়ে থাকে। চিরকালের খারাপ মাগী, ওর স্বভাবচরিত্তির তো ভালো ছিল না কোনোকালে। ট্যাকা আসে কিঅমনি দা'ঠাকুর ?

—ওর বড় ছেলেটা বুঝি মারা গিয়েছে—সেই পঞ্চা ?

—সে ওই মায়ের জ্বালায় বউ নিয়ে এ গাঁ থেকে উঠে গিয়ে হিংনাড়্যায় বাস করে'ল। বড় বউডার সঙ্গেও শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া ! বুধোর মার দাপটে এ পাড়া কাঁপে দা'ঠাকুর। আমাদের কিছু বলবার জো নেই। সবাই কিছু না কিছু ধারে ওর কাছে। ভয়ে কেউ কিছু বলতি পারে না।

—কেন ?

—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করে সবাই। দরকারে অদরকারে ধানের জন্যি বুড়ির কাছে হাত পাততি হয়। পয়সার জন্যি হাত পাততি হয়। পাড়াসুদ্দ সকলের মহাজন, কেডা কথা বলতি যাবে ?

পৌষ মাসে আমার নতুন কেনা জমিতে সামান্য কিছু ধান হল। আমার ধান রাখবার জায়গা নেই। সকলে বললে, বুধোকে বলুন, ওর গোলায় জায়গা আছে। তবে ওর মা—

বুধোর মাকে গিয়ে বললাম সোজাসুজি—ওগো, আমাদের দুটো ধান রাখবে তোমার গোলায় ?

—আমার গোলায় জায়গা কোথায় বাবাঠাকুর ?কতডি ধান ?

—বিশ চার পাঁচ। রেখে দিতেই হবে। নষ্ট হয়ে যাবে ধান তোমার গোলা থাকতে ?

বুধোর মা হেসে বললে—তা রেখে দিয়ে যাও।তবে চোর কি ইঁদুরে ধান নষ্ট করলি আমারে দায়িক হতি হবে না তো ?

হায় কালীপদ দাদু, তুমি বেঁচে থাকলে হয়তো ওর হাসিটা এত বয়সেও মাঠে মারা যেত না ! ভালো করে চেয়ে দেখে মনে হল এখনো ওকে বুড়ি বলা চলে না—অন্তত বুড়ি বলতে যা বোঝায় তা ও নয়। বেশ দোহারা চেহারা, লম্বা আঁটসাঁট গড়নের একটা আভাস আসে বটে, কিন্তু তা নয়, ঢিলেঢালা হয়ে গিয়েছে শরীর। তবে মুখের চেহারা এখনো আশ্চর্য রকমের ভালো—এত বয়সেও। গর্ব ও তেজ ওর চালচলনে, চোখের দৃষ্টিতে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে।

খুব বড় জমিদারি থাকলে ও দাপটের ওপর জমিদারি চালাতে পারত রানী চৌধুরানীর মতো। হয়তো ক্যাথেরিন দি গ্রেট কিংবা এলিজাবেথ হতে পারত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হলে। লুক্রেজিয়া বর্জিয়ার মতো নিষ্ঠুর আলো ওর চোখে এখনো খেলে—চোখ দেখে মনে হয়।

কিন্তু আমার ওপর ও কেন এত প্রসন্না হয়ে উঠল কে জানে ! আমার ধানগুলো গোলায় তোলবার সময় চমৎকার করে গোবর দিয়ে লেপাপোঁছা উঠোনে দু-দশটা ধান যা ছড়িয়ে পড়েছিল, নিজের হাতে ঝাড়ন দিয়ে ঝাঁট দিয়ে, খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগল। বললে—এ সব গোলায় তুলে রাখো বাবাঠাকুর, লক্ষ্মীর দানা নষ্ট করতি আছে ! তুলে রাখো যত্ন করে। দাঁড়াও, আরো দুটো ইদিকে ছড়িয়ে আছে—পোড়ারমুখোগুলো কি করে যে ধান তোলে, সব ঠ্যালামারা কাজ ! মন দিয়ে কি কেউ কাজ করে এ বাজারে !

অনেকদিন পরে আবার ওকে দেখে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। ভালোই লাগে।

আমি বলাম—তীর্থধর্ম করেছ ?

বুড়ি জিভ কেটে বললে—সে ভাগ্যি কি আমার হবে বাবাঠাকুর ?

—কেন, গেলেই হয় ! পয়সাকড়ির যা হক অভাব তো নেই !

—কে বললে বাবাঠাকুর ?পাড়ার মুখপোড়া-মুখপুড়িরা আমার নামে লাগায়। পয়সা কনে পাব ?

—দেখো, সে তোমার ইচ্ছে। আচ্ছা, এ গাঁ ছেড়ে কখনো কোথাও গিয়েছ ?

—গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে'লাম কালীগঞ্জে।

—আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখোনি ?

—না বাবা। একবার ও পাড়ার বিনু ঘোষের শাশুড়ি ঘোষপাড়ার সতীমায়ের দোলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তা আমার পায়ে ফোড়া হয়ে সেবার যাওয়া ঘটল না অদেষ্টে। অনেকদিনের কথা, তখন আমার পঞ্চা চার বছরের। ক বছর হল বাবা ?

—তা হয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর।

—এবার কোথাও যাব ভাবছি বাবা। চিরজম্মো কেটে গেল এই বাঁশবাগানের ডোবা আর গাঙের ঘাটে, আর মুচিপাড়ার মাঠ আর গোয়াল গোবর নিয়ে। এইবার একটু দেশ বিদেশডা দ্যাখব।

এর পরের ইতিহাসটা আমার সংগ্রহ করা বুধো মণ্ডলের শালীর বড় ছেলে ও তার খুড়শাশুড়ির কাছ থেকে। আর ও পাড়ার খুড়িমার কাছ থেকে। আমি নিজে জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী থেকে এসেছি, চটক পাহাড়ের ওপাশের নির্জন সমুদ্রবেলায় ঝাউবনের সঙ্গীত ও উদয়গিরি খণ্ডগিরির শ্যামশোভা, প্রাচীন যুগের তপস্বীদের আশ্রমগুলির ছবি আমার মনে যে স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে তখনো তাতে বিভোর হয়ে আছি, এমন সময় ও বাড়ির খুড়িমা এসে বললেন—ওমা, পুরী থেকে চলে এলে তুমি, আমি যে যাচ্ছি রথ দেখতে !

—তা কি করে জানব খুড়িমা, চিঠি দিলেন না কেন পুরীর ঠিকানায় ?

—তখন কি ঠিক ছিল বাবা ?কাল বসে ঠিক করলাম। আমি যাব আর বোষ্টম-বউ।

—আমার সঙ্গে যদি যেতেন ! আপনারা কখনো পুরী যাননি, বিদেশেও বেরোননি, একা যাওয়া এতদূর ! বিপদে না পড়েন !

—তুমি বাবা তোমার জানাশুনো লোককে চিঠি লিখে দাও। পাণ্ডাদেরও চিঠি লেখো।

সব বন্দোবস্ত করে চিঠিপত্র দিয়ে গ্রামসম্পর্কের খুড়িমাকে পুরীতে রওনা করে দিলাম। দিন পনেরো কেটে গেল।

একদিন কুমোরপাড়ার পথ দিয়ে বিকেলে আসছি, হঠাৎ সামনে পড়ে গেল বুধো মণ্ডল। আমি বললাম—কি রে, তোর মা ভালো আছে ?

—প্রাতোপেন্নাম। আজ্ঞে বাবু, মা তো ছিক্ষেত্তর গিয়েছে।

—সে কি ! তোর মা গিয়েছে ?কই জানি নে তো ?কার সঙ্গে ?

—আমার শালীর ছেলে আর এক খুড়শাশুড়ি গেল কিনা রথে, তাদেরই সঙ্গে।

—তা তো শুনিনি। ওপাড়ার খুড়িমা, মানে রামের মা, আর শশী বৈরাগীর স্ত্রী ওরা গেল সেদিন। ওরা একসঙ্গে—

—সে বাবু আমরা শুনিনি। তা হলে তো ভালোই হত।

কিন্তু যোগাযোগ ঠিকই ঘটেছিল।

ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের তীরে বাঁধাঘাটের সোপানে খুড়িমা সিক্তবসনে কাপড় ছাড়বার ব্যবস্থা করছেন, হঠাৎ অল্পদূরে কাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন। পাশেই ছিল বোষ্টম-বউ, তাকে বললেন—হ্যাঁগা বোষ্টম-বউ, ও কে দেখো তো ?আমাদের গাঁয়ের বুধোর মা না ?

শশী বৈরাগীর বউ চোখে কম দেখে। সে বললে—না মা ঠাকরুন, বুধোর মা এখানে কন থেকে আসবে ?আপনি যেমন— !

—এগিয়ে দেখোনা বউ, আন্দাজে মারলে হয় না। ও ঠিক বুধোর মা, যাও গিয়ে দেখে এসো।

বুধোর মা হঠাৎ সামনে স্বগ্রামের বোষ্টম-বউকে দেখে হাঁ করে রইল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

বোষ্টম-বউ এগিয়ে বললে—বলি দিদি নাকি ?ওমা, আমার কি হবে ! তাই বামুন-মা বললে—

বুধোর মায়ের আড়ষ্ট ভাব তখনো কাটেনি। বললে—কে ?

—বামুন-মা আমাদের। রামবাবুর মা। ওই যে ভিজে কাপড় ছাড়ছেন ওখানে—

—তোরা কবে এলি ?বামুন-দিদি কবে এলেন ?ওমা, আমি কনে যাব ! ই কি কাণ্ড !

—তাই তো !

—তোরা আসবি আমাকে তো বললি নে কিছু ?

—তুমি এলে কাদের সঙ্গে ?তা কি করে জানব যে তুমি আসবে ?

খুড়িমা ইতিমধ্যে কাপড় ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন। সুদূর বিদেশে নিজের গ্রামের লোকের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে পরস্পর দেখা হওয়া—এ যাদের ভাগ্যে না ঘটেছে তারা এর দুর্লভ আনন্দের এক কণাও উপলব্ধি করতে পারবে না।

বিশেষ করে এরা কখনো বিদেশে বেরোয়নি, এই সবে বিদেশে পা দিয়েই এ ধরনের ঘটনা।

খুড়িমা এক গাল হেসে বললেন—ওমা, আমি কোথায় যাব ! তুমি কবে এলে গা ?

বুধোর মা বললে—কি ভাগ্যি করে'লাম বামুন-দিদি ! তিথস্থানে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কি আশ্চর্য কাণ্ড ! কবে এলেন বামুন-দিদি ?

পরস্পর আলাপ-আপ্যায়নের পর বিস্ময়ের প্রথম বেগ কেটে গেলে সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলে, এখন থেকে ওরা একসঙ্গে থাকবে সবাই। সেদিন একই ধর্মশালায় সবাই গিয়ে উঠল, মন্দির দর্শন করলে, পরদিন সকালে একত্র গরুর গাড়িতে খণ্ডগিরি উদয়গিরি যাত্রা করলে।

এর পরবর্তী ইতিহাস খুড়িমা বা তাদের অন্যান্য সঙ্গীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

খুব সকালে রওনা হয়ে ওরা বেলা সাতটার সময় খণ্ডগিরি উদয়গিরির পাদদেশে বন-নিকুঞ্জে পৌঁছে গেল। খুড়িমা লেখাপড়া জানতেন, দু'-একখানা মাসিক পত্রিকায় খণ্ডগিরির বিবরণও পড়েছিলেন। তিনি সঙ্গিনীদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বুধোর মা কখনো পাহাড় দেখেনি জীবনে, এবার পুরী আসবার পথে বালেশ্বর ছাড়িয়ে পাহাড় প্রথম দেখে অবাক হয়ে যায়। উদয়গিরি-আরোহণ ওর জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে ওঠা।

খুড়িমার মুখে এ গল্প শুনতে শুনতে আমি চোখ বুজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলুম—মাত্র একদিন আগে যে উদয়গিরির নির্জন বনভূমিতে আমি আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে অমনি এক সুন্দর মেঘমেদুর প্রভাতে বসে বসে বনবিহঙ্গ-কাকলীর মধ্যে বহুশতাব্দী-পারের সঙ্গীত শুনেছিলুম—সেখানে গিয়ে বুধোর মায়ের মনের সে ভার্জিন আনন্দ।

সমতল পাষাণচত্বরের মতো শৈলশিখর, যেন প্রকৃতির তৈরি পাষাণবেদী। কত বন্য লতাপাতা, কুচিলা গাছের জঙ্গল, কত গুহা, কত কারুকার্য, কত যক্ষ-যক্ষিণী, কত নাগনাগিনী, পাষাণে পাষাণে মৌন অতীতের কত মুখরতা।

বুধোর মা বলে উঠল—কি চমৎকার পাথরে বাঁধানো ঠাঁই বামুন-দিদি। আমাদের গাঁয়ে শুধু কাদা আর ধুলো ! কত ভাগ্যি করলি তবে এসব জায়গায় আসা যায়। আচ্ছা, ওসব ঘরের মতো তৈরি করেছে কারা পাহাড়ের গায়ে ?

—মুনি-ঋষিদের গুহা।

—মুনি-ঋষিদের কী বললে বামুন-দিদি ?

—গুহা। মানে, থাকবার ফোকর।

—কে করেছে এসব ?গবরমেন্টো ?

—সেকালের রাজরাজড়ারা তৈরি করেছেন।

—এসব দেখলি চোখ জুড়োয় বামুন-দিদি। কখনো দেখিনি এসব। পিরথিমে যে এমন সব জিনিস আছে তা কখনো জানতাম না। জানবই বা কি করে, চেরকাল বাঁশবন ডোবা আর গরুর গোয়াল এই নিয়ে আছি !

নামবার পথে একটি ফর্সা স্ত্রীলোককে একটি ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা সেখানে গেল। খুড়িমা বললেন—আপনার এখানে ঘর ?

স্ত্রীলোকটি উড়িয়া ভাষায় বললো—হ্যাঁ, নিজের ঘর। তোমরা কোথায় যাবে ?

—রথ দেখতে এসেছি বাংলাদেশ থেকে। এখানে খাবার কিছু পাওয়া যায় ?

—আমি মুড়ি বিক্রি করি। আর আচার আছে—লঙ্কার, আমের, কুলের।

—কি রকম আচার দেখি ?

স্ত্রীলোকটি ঘরের ভিতর থেকে যা হাতে করে এনে দেখালে, সে কতকগুলো নুন-মাখানো আমের টুকরো এবং কুল। খুড়িমা বা তাঁর সঙ্গিনীরা সেসব পছন্দ করলে না। পথে আসবার সময় খুড়িমা বললেন—ওমা, ওর নাম নাকি আচার ! আম্‌সি আর শুকনো কুল, ওর নাম নাকি আচার ! এখানে আচার তৈরি করতে জানে না বাপু।

বুধোর মা তো আচার দেখে তখন হেসেই খুন হয়েছিল। বললে—না একটু তেল, না একটু গুড়, না দুটো মেথি কি কালজিরে। আচার বুঝি অমনি হয় ?আপনারা যেমন খান, আমাদের তো তা কিছুই হয় না, তাও ওদের চেয়ে ভালো হয়।

ভুবনেশ্বর স্টেশনে বিকেলে ওরা এল পুরী প্যাসেঞ্জারের জন্যে।

ট্রেনের তখনো দেরি। দক্ষিণ দিক থেকে সমুদ্রের অবাধ হাওয়া বইছে প্ল্যাটফর্মে। শেষরাত্রে উঠে ভুবনেশ্বর যেতে হয়েছিল, বুধোর মা ঘুমিয়ে পড়ল সেখানে কাঁথা পেতে। দু ঘণ্টা পরে ওদের প্রথম সমুদ্র-দর্শন হল পুরীতে। আষাঢ় মাসের দিন, তখনো সন্ধ্যা হয়নি।

পাণ্ডা বললে—দেখুন মা—

বুধোর মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্রের ধারে। নীল সমুদ্র ধু ধু করছে যতদূর চোখ যায়। ফেনার ফুল মাথায় বড় বড় ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে বালুবেলায়। দক্ষিণে বামে সামনে অকূল জলরাশি। খুড়িমা, বোষ্টম-বউ, বুধোর মা সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ। খুড়িমার যেন কান্না আসছে। কতক্ষণ পরে ওদের চমক ভাঙল। বুধোর মা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ই কি কাণ্ড বামুন-দিদি ! এমন কখনো ঠাওর করিনি গাঁয়ে থাকতি !

খুড়িমা বললেন—তাই বটে।

বুধোর মা বললে—উঃ রে জল !

খুড়িমা বললেন—তাই।

কেউই চোখ ফেরাতে পারছিল না সমুদ্রের দিক থেকে। ভেবে ভেবে বললে বুধোর মা—আচ্ছা বামুন-দিদি, ওপারে কী গাঁ ?

—রাম-রাবণের সেই লঙ্কা, বামুন-দিদি ?

—হ্যাঁ।

—কি কাণ্ড ! অ্যাদ্দিন মরছিলাম ডোবায় আর বাঁশবনে পচে, কত কি দ্যাখলাম !

—চল সব, এখুনি গিয়ে মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করে আসি।

জগন্নাথ বিগ্রহ ও বিরাট মন্দির দেখে সবাই অত্যন্ত খুশি। রাত সাড়ে নটার পরে জগন্নাথ বিগ্রহের সিঙার-বেশ হবে শুনে ওরা সকলে মন্দিরের অন্য অনেক মেয়েদের সঙ্গে বসে রইল। একটি বৃদ্ধার সঙ্গে খুড়িমার খুব আলাপ হয়ে গেল। তাঁর বাড়ি হুগলী জেলার সিঙ্গুরের কাছে কামদেবপুর। বাড়িতে তাঁর দুই ছেলে চাষবাস দেখে, তাদের ছেলেপুলে অনেকগুলি, মস্ত সংসার। বৃদ্ধার ভালো লাগে না সংসারের গোলমাল, বছরের মধ্যে চার-পাঁচ মাস পুরীতে প্রতিবৎসর কাটিয়ে যান। ভগবানের কথা, গীতার কথা ইত্যাদি বলতে ও শুনতে খুব ভালোবাসেন। মন্দিরে কোন্ এক সাধু এসেছেন, রোজ সন্ধ্যায় গীতার ব্যাখ্যা করেন, সে সব শুনলে মানুষের মন আর ছোট জিনিস নিয়ে মত্ত থাকতে পারে না। কাল খুড়িমার সময় হবে কি, তাহলে সিংহদরজার কাছে তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, নিয়ে যাবেন সেই সাধুর কাছে ওঁকে বা ওঁর সঙ্গিনীদের।

পাণ্ডা ওদের বাসায় নিয়ে এল। দোতলা ঘরের একটা কুঠুরিতে ওদের থাকবার জায়গা। ছোট জানালা দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া আসছে। দেওয়ালের গায়ে বাঁশের আড়ায় অনেকগুলো বেতের প্যাটরা তোলা। পাণ্ডাগিন্নি বললে—ওগুলোতে ওদের কাপড়চোপড় থাকে। পাণ্ডার বাড়িতে শালগ্রাম শিলার নিত্য পূজা হয়। বাড়ির মেয়েরা

যেমন সুন্দরী, তেমনই ভক্তিমতী। দোতলার ছোট্ট ঠাকুরঘরে অনেক পুরনো আমলের কাঁথা পাতা, কড়ি-ঝিনুকের দোলায় গৃহদেবতা বসানো, দেওয়ালে পদ্ম আঁকা, সর্বদা ধূপ-ধুনোর গন্ধ সে ঘরে। মেয়েরা স্নান করে ঠাকুরের স্তবপাঠ করে, ধপ ধপ করে ওদের গায়ের রং, মাথায় একঢাল করে কালো চুল।

বড় মেয়েটির নাম রুক্মিণী, সে বলে—মোর বাবা ভিতরছ পাণ্ডা।

খুড়িমা বলেন—সে কি ?

রুক্মিণীর মা বুঝিয়ে বলে—পাণ্ডাদের মধ্যে বড়। সিঙার-বেশ করবার একমাত্র অধিকার ওদের। সেইজন্যে উপাধি সিঙারি—বৃন্দাবন সিঙারির পুত্র গোবিন্দ সিঙারি। অনেক বেশি মান ওদের। দুজন গোমস্তা, তিন-চারজন ছড়িদার মাইনে করা, কটক থেকে পর্যন্ত যাত্রী বাগিয়ে আনে।

রাত্রে ওদের জন্যে মন্দির থেকে এল ঘিয়েভাজা মালপোয়া, ভুরভুর করছে গব্যঘৃতের সুগন্ধ তাতে, আরো দু-তিন রকম মিষ্টি। পাণ্ডাগৃহিণী বললেন—কাল কণিকা-প্রসাদ আনিয়ে দেব শ্রীমন্দির থেকে। মধ্যাহ্নধূপ সরে গেলেই লোক পাঠাব।

সকালে উঠে ছড়িদার ওদের নিয়ে সমুদ্রস্নান করাতে গিয়ে একজন নুলিয়ার জিম্মা করে দিলে।

বুধোর মা বলে উঠল—ও বামুন-দিদি, ই কি কাণ্ড ! এ যে আমারে নিয়ে নাচতি লাগল ঢেউয়ে !

বোষ্টম-বউকে উত্তাল এক ঢেউয়ে তুলে নিয়ে সপাটে এক আছাড় মারলে বালির চড়ায়।

স্নানান্তে মন্দিরে গিয়ে সবাই ঠাকুরদর্শন করলে ! কাল রাত্রের সেই বৃদ্ধাটির সঙ্গে বিমলাদেবীর মন্দিরে দেখা। তিনি নিজে নিয়ে গেলেন ওদের নৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রাঙ্গণ পার হয়ে। সেদিন মধ্যাহ্নধূপ সরতে একটু দেরি হয়ে গেল, কণিকা-প্রসাদ নিয়ে পৌঁছুল বাসায় বেলা চারটের সময়। খুড়িমার একটু কষ্ট হল, অন্যান্য সঙ্গিনীদের খাওয়া অভ্যেস বেলা তিনটের সময়, তারা বিশেষ অসুবিধে অনুভব করলে না।

সন্ধ্যাবেলায় বিমলাদেবীর মন্দিরের চাতালে সেই সাধুটির গীতা-ব্যাখ্যা হচ্ছে।

ওরা সবাই গিয়ে বসল সেখানে হাত জোড় করে। আরো অনেক বৃদ্ধা সেখানেই উপস্থিত, প্রায় সকলের হাতেই জপের মালা। সকলে একমনে গীতার ব্যাখ্যা শুনছে।

বুধোর মা কিছুই বুঝলে না। দু-চারবার বোঝবার চেষ্টা যেনা করলে এমন নয়, কিন্তু কি যে বলছেন উনি, যদি একটা কথার অর্থ সে বুঝে থাকে। তবুও তার চোখ দিয়ে জল এল—কোনো কারণে নয়, এমনিই। কেমন সুন্দর কথা বলছেন উনি, মুনি-ঋষিদের মতো চেহারা। কতবড় উঁচু মন্দির, বাবাঃ ! উই কেমন একটা লাল শাড়ি পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ! আচ্ছা কত টাকা খরচ হয়েছে না-জানি এই মন্দির তৈরি করতে ! পাশের একজন বৃদ্ধাকে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—মন্দিরডা কারা তৈরি করে'ল মা ?

বৃদ্ধা একমনে শুনছিলেন—বিরক্ত হয়ে বললেন—আঃ, একমনে শোন না বাপু—

বুধোর মা অপ্রতিভ হয়ে বললে—না, তাই শুধোচ্ছিলাম।

ওদিক থেকে কে ধমক দিয়ে উঠল—আঃ !

আর একজন কে টিপ্পনী কাটলে—শুনতে আসে না তো, কেবল গল্প করতে আসে।

বুধোর মার বড় রাগ হয়ে গেল। একটু কথা বলবার জো নেই, বাব্বাঃ ! মাগীদের যদি একবার পেতাম আমাদের গাঁয়ে, তবে দেখিয়ে দেতাম—।পরক্ষণেই সে রাগ সামলে গেল। না না, সে মহাপাপী। জগন্নাথ প্রভু দয়া করে তাকে এনেছেন এখানে। নইলে তার কি সাধ্যি সে এখানে আসে ?মন্দিরে এসে রাগ করতে নেই। কেমন সুন্দর জায়গা, কত সব ভালো লোক, কেমন ভালো কথা ! এসব কথা কেউ তাদের গাঁয়ে বলে ?ও-

রকম বুড়ো তো কতই আছে—ন'লে জেলের বাবা কেদার, কাক-তাড়ানে ?পাচু, শ্যামা যুগী, বেহারি কুমোর—আরো দু'একটা নাম মনে আসতে সে তাড়াতাড়ি চেপে গেল। ও-সব কিছু নয়, মুখে মার ঝাঁটা মুখপোড়াদের।

এতকাল সে কোথায় কোন্ গর্তে পড়ে ছিল ?কি চমৎকার জায়গা, কি পুণ্যির জায়গাতে জগন্নাথ দয়া করে তাকে এনে ফেলেছেন ! গীতার ব্যাখ্যা শেষ হয়ে গেলে সবাই যখন চলে আসছিল, তখন সে আবার কাকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এ মন্দিরডা কে তৈরি করে'ল মা-ঠাকরোন ?

—বিশ্বকর্মা।

—বটে !

বুধোর মা আবার অবাক হয়ে কতক্ষণ মন্দিরের দিকে চেয়ে রইল।

খুড়িমা পিছন থেকে বললেন—ও বুধোর মা, অমন কথা বলতে আছে শাস্ত্রপাঠের সময় ?ছিঃ, আর অমন করো না !

রাত্রে বাসায় এসে বুধোর মায়ের উৎসাহ কি ! বললে—ও বামুনদিদি, বড্ড ভালো লাগছে আমার। যে-কডা টাকা হাতে আছে, তীথিধম্মেই খরচা করব। কি ভাগ্যি ছেল আমার যে এখানে এনেছেন জগন্নাথ !

রুক্মিণীর মা ওদের কাছে বসে বসে জগন্নাথদেবের অনেক মহিমাকীর্তন করলেন। কলিকালের জাগ্রত দেবতা জগন্নাথ। যে যা কামনা করে, তাই তিনি পূর্ণ করেন। কলিকালে অন্ন ব্রহ্ম, অন্নদান মহাসেবা। তাই তিনি শুধু অন্ন বিতরণ করছেন দু হাতে। যে যেখানে ক্ষুধার্ত আছে, সকলকে শুধু পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন তিনি। ধ্যান-ধারণা তপস্যা এসব শিকেয় তুলে রাখো—অন্ন বিলোও, শুধু অন্ন বিলোও। অন্নদান মহাযজ্ঞ।

বুধোর মা এ-কথাটা কিছু কিছু বুঝতে পারে। গত বছর বর্ষাকালে, যখন লোকে না খেয়ে মরছে তাদের গাঁয়ের আশপাশে, তখন নিজের গোলা থেকে সে মুচিপাড়ার সতেরো জন লোককে বিনা বাড়িতে ন বিশ ধান কর্জ দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিল—মুচিদের ধান কর্জ দিলে বুধোর মা, ওদের লাঙল নেই, জমি নেই, কর্জ শোধ দেবে কি করে ?বাড়ি দেওয়া তো চুলোয় যাক গে !

বুধোর মা গ্রাহ্য করেনি সেসব কথা।

আজ সিঙারিগিন্নির মুখে জগন্নাথের অন্নদান-মাহাত্ম্য শুনে ওর বুকখানা দশ হাত হল। ভগবান তাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাহলে ! সবাই তাকে মন্দ বলে তাদের গাঁয়ে, তারা এসে দেখুক এখানে।

সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে ঠাকুরদর্শন করতে গিয়ে বিগ্রহের দিকে চেয়ে ও আজ ভালো করে দেবতাকে যেন বুঝতে পারলে। সে যা বোঝে—অন্নদান মহাপুণ্য। সে নিজের গোলার ধান আর-বছর আকালের সময় বার করে মুচিদের দিতে যায়নি ?গনশা মুচির ভাইবউ ছোট্ট খোকাটার হাত ধরে এসে ওকে আর বছর শ্রাবণ মাসে বললে—ও দিদিমা, কাল থেকে মোর খোকার পেটে দুটো দানাও যায়নি। একটা উপায় যদি না করেন, সবসুদ্দ না খেয়ে মরতি হবে। ধামা বেঁধে তোমার নাতি আজ দুদিন আগে আট আনা রোজগার করে এনে'ল। তাতে কদিন খাওয়া হবে বলো ! দু টাকা করে চালির কাঠা। একটা হিল্লে করতে হবে দিদিমা।

ও বললে—ধামা নিয়ে আসিস এখন মানকের বউ, ধান দেব। একজন যদি নিয়ে গেল, অমনি দশজন এসে পড়ল। মুচিপাড়ার সব ভেঙে পড়ল ধামা-কাঠা হাতে। সবাই কান্নাকাটি করতে লাগল। খেতে পাচ্ছি নে দিদিমা, ধান দেও। কাউকে সে শুধু-হাতে ফিরিয়ে দেয়নি। এতদূর থেকেও জগন্নাথদেব তা জানেন। তাই কি এতদূর থেকে তাকে ডেকে এনেছেন ?সেদিন কিসের সেই সব হিজিবিজি কথা বলছিল দাড়িওলা সন্নিসিঠাকুর ! সে কিছুই বুঝছিল না। আজ জগন্নাথের কথা সে ঠিক বুঝতে পেরেছে।

অন্নহীন যে, তাকে খাওয়াও, মাখাও। গোলার ধান কর্জ দাও, ওদের বিনা বাড়িতেই কর্জ দাও।

খুড়িমাকে সে ফেরবার পথে সব বললে।

জ্যোৎস্নারাত্রে সমুদ্রের ধারে ওরা সবাই গেল, বুধোর মা-ও গেল। কূলকিনারা নেই জলের, আর কি চমৎকার জ্যোৎস্না ! কাল যে বৃদ্ধাটির সঙ্গে মন্দিরে দেখা, তিনিও ছিলেন। কে একজন বড় সন্নিসি, নাম শ্রীচৈতন্য, এমন জ্যোৎস্নারাত্রে নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, উনি বলেছিলেন সে গল্প। না, সে নিজে কখনো ওঁদের নামও শোনেনি। অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কে ওঁদের নামশোনাচ্ছে ?সে জানে পায়রাগাছির ফকিরের নাম। পায়রাগাছির ফকিরও মস্ত সাধু। সেবার তার একটা গাইগরু কি খেয়ে হঠাৎ মরে যায় আর কি, সবাই বললে পায়রাগাছির ফকিরের খুব ক্ষমতা। বুধোকে সেখানে পাঠানো হল। ফকির সাহেবের সামান্য কি ওষুধে গরু একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ওঁরা সবাই ভালো, সবাই বড়। সে-ই কেবল পাপী।

বুধোর মা-ও দু হাত জুড়ে পায়রাগাছির ফকির সাহেবের উদ্দেশে প্রণাম করে।

খুড়িমা বললেন—চল বুধোর মা, বাসায় ফিরি। ভালো লাগছে ?

—পাপমুখে কি করে আর বলি বামুনদিদি ! ইচ্ছে হচ্ছে জগন্নাথের পায়ে চেরজম্ম পড়ে থাকি। সুদ্দু ওই ছোট নাতনিটার মায়া। আমার হাতে না হলি দুষ্টু মেয়ে খাবে না। এখন বসে বসে তার কথাই বড় মনে হচ্ছিল। আহা, কদ্দিন মুখটা দেখিনি।

বুধোর মা আঁচলে চোখ মুছলে।

সে-রাত্রে শুয়ে বুধোর মা ছটফট করছে, অনেক রাত্রেও কাতরাচ্ছে দেখে খুড়িমা ও বোষ্টম-বউ ওকে ডাক দিলেন। দেখা গেল, ওর বড্ড জ্বর হয়েছে। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল বুধোর মা। সেদিন ভুবনেশ্বর ইস্টিশনের প্ল্যাটফর্মে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুর খানিকটা কেটে যায়। সেই কাটা জায়গাটা বিষিয়ে উঠেছে, পরদিন দেখা গেল। জ্বর কমে না দেখে ডাক্তার ডেকে দেখানো হল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে রোগীকে হাসপাতালে দেওয়া হল।

তিন দিন পরে—রথের আগের দিন।

বুধোর মার অবস্থা খুব খারাপ। খুড়িমা, বোষ্টম-বউ, গ্রামের সবাই ঘিরে বসে, এমন কি সেই বৃদ্ধা পর্যন্ত ! কখনো কখনো জ্ঞান হয়, কখনো আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার বলছে, অবস্থা ভালো নয়।

খুড়িমা বললেন—ও বুধোর মা, কেমন আছ ?

—ভালো না, বামুনদিদি।

—বাড়ি যাবে ?

—শরীরডা সেরে উঠলে চলুন যাই বামুনদিদি। ছোট নাতনিটার জন্যি মন কেমন করছে !

ভক্তিমতী বৃদ্ধাটি বললেন—ভগবানের নাম করো দিদি। বলো—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও।

রাত বারোটার সময় আর একবার জ্ঞান হল ওর। জ্ঞান হলেই বলে উঠল—ও মুখুজ্যে ঠাকুর, আমার সেই সাত গণ্ডা ট্যাকা—

খুড়িমা মুখের ওপর ঝুঁকে বললেন—কি বলছ, ও বুধোর মা ?

—আমার সেই সাত গণ্ডা ট্যাকা আর শাড়ি দেবা না ?

—হরিনাম করো। হরি হরি বলো। বলো, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে !

—আমবাগানের তলায় মুখুজ্যে ঠাকুরের সঙ্গে সিঁদুরকৌটো গাছটার কাছে দেখা। ঘাটের পথ। লোকজনের যাতায়াত বড়। এখান থেকে সরে চল ওদিকি, ও মুখুজ্যেঠাকুর !

আমি খবরটা জানতাম না।

রথের দিন-পাঁচ-ছয় পরে বুধোর সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা। ওর গলায় কাছা দেখে একটু অবাক হয়ে বললাম—কি রে, গলায় কাছা কেন ?

বুধো বললে—মা নেই। চিঠি এসেছে কাল। রথের দিন মারা গিয়েছে।

পরে একটু থেমে বললে—তিনি ভালোই গিয়েছে। বয়েস তো কম হয়নি। কিন্তু এতগুলো ট্যাকা দাদাঠাকুর, কোথায় যে রেখে গেল, সন্ধান দিয়ে গেল না ! কাউকে তো বলত না ট্যাকার কথা।

গ্রামে সবাই বললে—রথের দিন তিথিস্থানে মিত্যু, কি জানি কি রকম হল ! অমন স্বভাব-চরিত্তির, চিরকালের খারাপ মেয়েমানুষ, জগন্নাথের নিতান্ত কিরপা না হলে কি এমন হয় ! মাগীর অদেষ্ট ছেল ভালো।